হারিত

[ভারতে ছাত্র পরিচালিত সর্বপ্রথম পত্রিকা]

ত্রয়োদশ বর্ষ ※ শ্রাবণ ১৪০৪ ※ আগষ্ট ১৯৯৭

সম্পাদক মণ্ডলী

যুগ্ম সম্পাদক—সৌভিক বসাক ও সুমন চ্যাটার্জী

সহ সম্পাদক—শুভ্র ব্যানার্জী, বিবেক কুণ্ডু, সন্দীপ বসু, সুদীপ্ত চ্যাটার্জী

সদস্য—শঙ্খ শুভ্র মিশ্র, আশিষ ঘোষ

প্রকাশক—শুভময় নাগ

সূচীপত্র

※ সম্পাদকীয়

কলকাতা একটি মৃত শহর নয় / পিনাকী বিশ্বাস—৩ □ ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রথম ৫০ বছর (১৭৮০-১৮৩০) / অনুপম দত্ত—৪ □ জন্মান্ধ আর রুদ্দুর / অরুণসৌম্য মুখোপাধ্যায়—৬ উপেক্ষিত বাংলা / প্রবালকান্তি ব্যানার্জী—৭ □ প্রসঙ্গ : সুভাষচন্দ্র / অভিষেক পাল—৮ বন্ধু / সম্রাট চক্রবর্তী—১০

কবিতা

পরম বন্ধু / অভিষেক মজুমদার—১১ □ যানবাহন ও দূষণ / অনির্বাণ কুণ্ডু—১১ □ রোদন / পরাগ গুহঠাকুরতা—১১ □ ছবি / তরুণ শঙ্কর কুণ্ডু—১১ □ অনুভব / শুভ্র ব্যানার্জী—১২ □ হৃদয়েষু / দেবর্ষি মণ্ডল—১২ □ বল কেন এমন হলো / স্বপন কুমার সাহা—১৩ □ ধিক্কার / অম্বরীশ সরকার—১৩

"প্রাইভেট টিউশন বনাম বিদ্যালয়—একটি আত্ম মূল্যায়ন" / অরিজিৎ বসু—১৪ □ ক্রিকেট প্রাদেশিক মাধ্যম / সন্দীপ কুমার বসু—১৫

সম্পাদকীয়

"ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।"

বিশ্বকবির এই আশীর্বাণী বর্ষিত হয়েছিলো "সবুজ পত্র" পত্রিকার উদ্দেশ্যে। সবুজপত্র আজ আর নেই, তাই অর্থগত কিছু মিল যুক্ত হারিত পত্রিকার শিরে কবির এই আশির্বাণীকে গ্রহণ করেই আমরা এগিয়ে চলতে চাই। ত্রিশের দশকে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়েছিলো প্রচলিত সাহিত্য রীতির এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের সংকল্প নিয়ে। আজকের হারিত তারই উত্তর সূরী। প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এক 'নতুন যুগের' ভোরে উপস্থিত হবার সংকল্প নিয়ে হারিতের জয়যাত্রা। হারিত বিদ্যালয় ছাত্র পরিচালিত ক্ষুদ্র এক পত্রিকা। কলেবরে ক্ষুদ্র লেখক সম্পাদক গোষ্ঠীও এর পরিবর্তনশীল। তবু এক নির্দিষ্ট মন্ত্রগুপ্ত হারিতের এগিয়ে চলার পাথেয়। এই মন্ত্র হলো নবীনবরণ। নবীন লেখকদের নব উজ্জীবন রসে পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে হারিতের ক্রম পর্যায়ের সংখ্যাগুলি। সকলের ভালোবাসা প্রেরণা বুকে নিয়ে আমরা এগিয়ে চলবো উত্তরণের পথে।

With Best Compliments from :

Phone : 241-7301

GOODNAMES

EXCHANGE

Your Old T.V. VCR, Fridge, Air Conditioner
Used Car and old Furniture with New One

"কলকাতা একটি মৃত শহর নয়"

—পিনাকী বিশ্বাস, নবম শ্রেণী

কলকাতা এই নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের হাসি, কান্না, বেদনা, ব্যথা, সুখ ও দুঃখ। কলকাতা গরীবদের কলকাতা ধনীদেরও। কলকাতায় এমন অনেক লোক আছে যাদের সুখ নেই, স্বপ্ন নেই, অতীত নেই, আছে শুধু বর্তমান। আবার অনেকেই থাকে টাকার গদির ওপর শুয়ে।

কলকাতায় এমন বহু অগণিত বিষয় আছে যা প্রতিনিয়ত শহরবাসীর জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিসহ। মাঝেমাঝেই এই শহরে বিভিন্ন অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য বেরোয় রাজনৈতিক দলগুলির মিছিল, ফল হিসেবে সাধারণ জনগণ যা পায় তা কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ নয়, তা শুধুই সন্ত্রাস, জনগণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টিই যেন এই মিছিলগুলির মূল উদ্দেশ্য। আবার যদি পৃথক পৃথক দুটি রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বেরোনো দুটি মিছিল পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তবে তো আর কথাই নেই শুরু হয়ে গেল মারামারি বোমাবাজি ইত্যাদি বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা এবং ফলপ্রসূ হিসেবে পাওয়া যায় তা হল যেকোন একটি দলের লোকের আহত হওয়ার বিরুদ্ধে ডাকা বন্ধ। যার দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রা হয় চরমভাবে বিপর্যস্ত। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা যে বিশাল অন্যায় করে ফেলেন তার হিসেব জনগণকেই কড়ায় গণ্ডায় মেটাতে হয়।

এছাড়াও যান জট তো কলকাতায় প্রতিদিনের এক সমস্যা। হয়তো এমন একজন হার্টের রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যার পৌঁছোতে আধঘণ্টা দেরী হলেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় গাড়ীটি পড়ল জ্যামে আর আধঘণ্টা কি, একঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর গাড়ি চলল এবং যখন তারা হাসপাতালে পৌঁছালো, তার অনেক আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।

কলকাতায় একটি কথা সর্বাঙ্গিকভাবে খাটে। সেটি হলো—"বৃষ্টি হয় যেদিন কলকাতায় জলও জমে সেদিন"। কলকাতা কর্পোরেশনের নিযুক্ত শহর পরিস্কার রাখার কর্মচারীরা কাজ করে না বলেই ঘটে এই বিপর্যয়।

অগুন্তি জনবসতির চাপে কলকাতা এখন মায়া নগরী হয়ে উঠেছে। এই কথাটি যেমনই হাস্যকর তেমনই সত্যি, রাস্তার অসংখ্য গাড়ি ও কলকারখানার ধোঁয়া মিলে এক অদ্ভুত ধোঁয়াজালের সৃষ্টি করে। দূর থেকে যদি কলকাতাকে দেখে মায়ানগরী বলেন তাহলে আশ্চর্য হওয়ার বিন্দুমাত্র কোনও কারণ নেই।

বর্তমানে শোনা যাচ্ছে যে কলকাতা নাকি একটি মেগাসিটি হতে চলেছে। কিন্তু যেখানে এইরকম পরিস্থিতি সেখানে মেগাসিটি হওয়া তো দূরের কথা মনে হয়। এই শহর রোজ একটু একটু করে নিজের অস্তিত্ব হারাতে বসেছে।

কিন্তু আমরা তো মর্ত্যবাসী, যদি এই শহর সর্বাঙ্গিকভাবে সুন্দর হতো তবে এটি শহর না হয়ে স্বর্গ হতো আর আমরাও স্বর্গবাসী হতাম। সবকিছুর মধ্যেই তো দরকার বৈচিত্র্যের। জীবনে দুঃখ না থাকলে সুখকেও ভালভাবে উপভোগ করা যায় না। কিন্তু মা যদি কুৎসিৎ হন তবুও তাঁর ছেলের কাছে তিনি তো চিরদিনই জননী থাকবেন। অন্যদের চোখে সে কর্দমাক্ত নারী হলেও সন্তানের কাছে সে জননী। তেমনই আমরা নগরবাসীরা কলকাতার এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েও জীবনযাত্রার আনন্দ উপভোগ করতে পারি।

ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রথম ৫০ বছর (১৭৮০-১৮৩০)

অনুপম দত্ত, নবম শ্রেণী, খ-বিভাগ

সাল ১৭৬১, স্থান—Society for promoting christion knowledge, Madras (অধুনা চেন্নাই) ; উপরোক্ত সাল এবং স্থানটি কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ ঐ সময় ঐ স্থানেই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনকার্য এবং নানা ধর্মীয় কাজের জন্য মাদ্রাজে মুদ্রাযন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছিল। কলকাতায় মুদ্রণযন্ত্রের শুভাগমন ঘটে ১৭৭৭ সালে। জেমস্ অগাস্টাস হিকির হাত ধরে এবং এই ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র "The Bengal Gazette" প্রকাশিত হয় ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারিতে। এই কর্মের কর্তাও কিন্তু জেমস্ অগাস্টাস হিকি। অবশ্য ১৭৬৬ সালে উইলিয়াম বোল্টস সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য কোম্পানির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোম্পানী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। সে যাইহোক ১৭৭৮ সালে কোম্পানী নিজস্ব উদ্যোগেই কলকাতার সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে। ১৮০০ সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেস। ১৭৮০ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে ১৯টি সাপ্তাহিক এবং ৫টি মাসিক পত্রিকা ৪০ জন মুদ্রাকর কর্তৃক প্রকাশিত হত। এদের মধ্যে আবার "The Bengal Universal Intelligence" সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত। হিকির গেজেটের পর কলকাতার দ্বিতীয় সংবাদপত্রের গৌরব লাভ করে "ইণ্ডিয়া গেজেট"। ইতিমধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশনার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৮৫তে মাদ্রাজ কুরিয়ার মাদ্রাজের প্রথম সংবাদপত্ররূপে

আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৭৮৯ সালে "বম্বে হেরাল্ড" বম্বের (অধুনা মুম্বাই) সর্বপ্রথম সংবাদপত্র হিসেবে জনসমক্ষে উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ১৮১৮-এর ১৫ই মে'র পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্র হয় ইংরেজী ভাষার। ১৮১৪, ১৮১৫ এবং ১৮১৮ সালে যথাক্রমে প্রকাশিত হয় "ক্যালকাটা টাইমস", "গভর্নমেন্ট গেজেট", "ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া" এবং "ক্যালকাটা জার্নাল"। এর মধ্যেই ১৮১৮ সালের এপ্রিলে জন ক্লার্ক মার্শ ম্যান কর্তৃক শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন থেকে প্রকাশিত "দিগ্‌দর্শন" বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের যেকোন আঞ্চলিক ভাষাতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম পত্রিকা। আবার ১৮১৮ সালেরই ১৫ই মে তারিখে হরচন্দ্র রায় সম্পাদিত এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত "বাঙ্গাল গেজেট"-ই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। কারণ তার পূর্ববর্তী পত্রিকা "দিগদর্শন" ছিল সাময়িক পত্র, তাকে সংবাদপত্র আখ্যা দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। "বাঙ্গাল গেজেট" প্রকাশিত হয় ৪৫ নং চোরবাগান ষ্ট্রীট থেকে ; এটিই সর্বপ্রথম কোন ভারতীয় দ্বারা সম্পাদিত এবং প্রকাশিত পত্রিকা। তারপর একে একে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮২২ সালের ১লা জুলাই মারাঠী ভাষার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন কারণ ঐ দিনই প্রথম মারাঠী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রথম হিন্দি সংবাদপত্রটি কিন্তু কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে। তারপর যথাক্রমে ১৮৩১ এবং ১৮৩৬ সালে মাদ্রাজ থেকে সর্বপ্রথম তামিল তেলেগু ভাষার সংবাদপত্র "তামিল ম্যাগাজিন" এবং "সত্যদূত" প্রকাশিত হয়। ভারতের সর্বপ্রথম মাসিক সংবাদপত্রটি হল "The Oriental Magazine of Calcutta Amusement" এটি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মিশনারীগণ ছাড়া অন্যান্য যেসব সংবাদপত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হয়—বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮), ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮৩১), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), দলবৃত্তান্ত (১৮৩২), সংবাদ রত্নাবলী (১৮৩২)। ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রথম ৫০ বছরে "ভারত পথিক" রামমোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। ১৮০১ সালে রামমোহন রায়ের পদধূলি কলিকাতা নগরীতে পড়লেও রামমোহন তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ১৮২১ তে সংবাদপত্রটির নাম "The Brahmunical Magazine—The Missionary and the Brahmin"। তিনি "শিবপ্রসাদ শর্ম্মা"—এই ছদ্মনামে পত্রিকাটি প্রকাশ করে। এটির বাংলা নাম একটু লক্ষণীয় "ব্রাহ্মণ সেবধি", "ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সংবাদ"। এটি ছিল দ্বিভাষিক। এর এক পাতায় বাংলা অন্য পাতায় ইংরেজী অনুবাদ থাকত। তবে কোন অনির্দিষ্ট কারণে পত্রিকাটি বেশীদিন চালু থাকেনি। এরপর ১৮২১ সালেই ডিসেম্বর মাসে তিনি সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশ করেন। অর্থাৎ 'বাঙ্গাল গেজেট'এর পরে "সম্বাদ কৌমুদী"-ই হল বাঙ্গালী পরিচালিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র। এখানে আবার "কৌমুদী"র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ভবানীচরণ ১৮২২ সালে সম্পাদকমণ্ডলীর পদ থেকে ইস্তাফা দেন এবং "সমাচার চন্দ্রিকা" নামক নতুন পত্রিকা প্রকাশ করেন। আবার ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে রামমোহন

"সীরাৎ-উল-আসবার" বা "সংবাদ দর্শন" পত্রিকা সূচনা করেন। রামমোহন জন অ্যাডামের Press Act-এর প্রতিবাদে এই পত্রিকা বন্ধ করে দেন। তারপর রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে "বেঙ্গল হেরাল্ড" নামে একটি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করে। আর হেরাল্ডের পরিপূরক ছিল বাংলাভাষার আরেকটি পত্রিকা, নাম "বঙ্গদূত"। ১৮২৯ সালের জুনমাসে আবার হেরাল্ড পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় বঙ্গদূতও ১৮৩১ সালে। অবশ্য ১৮৩১ সালেই বঙ্গদূত প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'রিফর্মার' এবং রামমোহনও বিলেত যাত্রা করেন ঐ সময়ই। তার বিলেত যাত্রার সাথে সাথেই ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রথম যুগ অতিক্রান্ত হয়। এমনিভাবেই নানা উত্থান-পতন, নানা সুবিধা-অসুবিধার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্র তার ৫০ বছরের দীর্ঘ যাত্রা সমাপ্ত করে।

জন্মান্ধ আর রোদ্দুর

অরুণসৌম্য মুখোপাধ্যায়

জন্ম থেকেই আমি চোখে দেখতে পাই না। আজ ভোরে আয়ার সঙ্গে জীবনে প্রথমবার লেকে বেড়াতে এসেছি। চোখে কালো চশমা; হাতে ব্লাইন্ড স্টিক। লেকের অন্যদিকে সদ্য ওঠা সূর্যের মৃদু উত্তাপ আমার মনে বাজিয়ে চলে অনুভূতির অনুরণন। নিজের অজান্তেই আজ যেন আমি আস্তে আস্তে সূর্য ওঠা দেখতে পাচ্ছি। দৃষ্টিশক্তিহীন মণিদুটো তিরতির করে কাঁপছে অজানা আশঙ্কায় ভীরু ইউক্যালিপ্টাস পাতার মতন। তাতে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে সূর্য ওঠার রঙ। কাঠের বেঞ্চ ছেড়ে জলার ধারে ঘাসে গিয়ে বসি। সূর্য ওঠার অনুভূতিমালা আমাকে ফিরিয়ে দেয় দৃষ্টিশক্তি।

রোদ্দুর ওই জলার ওধারে একটু একটু ওঠে—
সোনালী আকাশে, ঘাসের গন্ধে, রোদ্দুর খোলা মাঠে ;
রোদ্দুর এই লেকের জলেতে কুচিকুচি হয়ে যায়,
রোদ্দুর : এই অন্ধ মণিতে না দেখার বিস্ময়।
শিশিরের গায়ে আহ্লাদে চলে রোদ্দুর লুটোপুটি,
মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, আকাশের খুনসুটি।
আমার শরীরে সূর্য কেমন উষ্ণ পরশ দেয়,
রোদ্দুর ঠিক ওঠে, তখন সবকিছু দেখা যায়।

উপেক্ষিত বাংলা

প্রবালকান্তি ব্যানার্জী, দ্বাদশ শ্রেণী

ভারতীয় ক্রিকেটে উপেক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। এইরকম একজন উপেক্ষিত বাঙালী ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দোপাধ্যায়। তার সময় ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষা করতেন সৈয়দ কিরমানি, তাই ভালো পারফরমেন্স করা সত্ত্বেও ভারতীয় দলে ঠাঁই হয় নি সম্বরণের। সেই উপেক্ষিত ভদ্রলোকই বর্তমানে পূর্বাঞ্চলের নির্বাচক। তাই শিকে ছিঁড়েছে কিছু বাঙালীর বা বলা ভালো বাংলার ক্রিকেটারের। সম্বরণ নির্বাচক হবার পর একে একে ভারতীয় দলে ঢুকছেন প্রশান্ত বৈদ্য, উৎপল চ্যাটার্জী, সৌরভ গাঙ্গুলী এবং সাবা করিমের মতো ক্রিকেটার, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভালো, প্রত্যেককে ঢোকাবার জন্য প্রচণ্ড লড়াই চালাতে হয়েছে সম্বরণকে, প্রত্যেকবারই তারা চিহ্নিত হয়েছেন কোটার ক্রিকেটার বলে। এদের মধ্যে প্রথম দুজন ভালো পারফরমেন্স করতে না পেরে পুনরায় ছিটকে গেছেন ভারতীয় দল থেকে। তবে উৎপল, যথেষ্ট ভালো ভাবে শুরু করার পরও বাদ চলে গেছেন কেবলমাত্র একটা ম্যাচের ফলাফলের ভিত্তিতে। বাকীদের মধ্যে সৌরভের কাহিনী তো বর্তমানে ইতিহাস। লর্ডসে মহারাজের বিক্রম, তাকে চিরস্থায়ী করেছে ভারতীয় দলে। যারা প্রথমে সৌরভের নাম শুনেই নাক শিঁটকেছিলেন, এমন বহু প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং তৎকালীন অধিনায়ক আজাহারউদ্দিন পর্যন্ত ঢোক গিলতে বাধ্য হয়েছেন। বর্তমানে তাদের শেষ ধাক্কাটি দিয়েছেন সাবা করিম। যাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে পর্যটক হিসাবে ঘুরে বেড়াতে হত। হঠাৎ সুযোগ পেয়েই দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবয়ের বিরুদ্ধে তিনি করেছেন পঞ্চান্ন ও আটত্রিশ রান, যা এই সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। সত্যিই কেমন ব্যাটিং করেছেন সাবা? দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে শন পোলকের বলে তার ছক্কা বিস্মিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম নির্বাচক পিটার পোলককে, তার বিস্ময়, এইরকম একজন ক্রিকেটার কি করে ভারতীয় দলের বাইরে ছিল। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কম-বেশি সকলেই। তাদের মতে আর বোধহয় বসানো যাবে না সাবাকে।

এ তো গেল বাংলার ক্রিকেটারদের কথা, বাংলার বাইরে থাকা বাঙালীরাও কোন কোন সময় চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বিহারের সুব্রত ব্যানার্জীর কথা। সুপরিকল্পিতভাবে নষ্ট করা হয়েছে একদা ডেনিস লিলির প্রিয় ছাত্রটিকে। করেছেন আজাহার অ্যাণ্ড ওয়াদেকার কোম্পানী।

কিন্তু বাংলার বাইরের ক্রিকেটারদের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভারতীয় দলে এমন বহু ক্রিকেটার ছিলেন বা আছেন, যাঁরা শুধুমাত্র অধিনায়কের রাজ্যের ছেলে বলেই সুযোগ পান বা এখনও পেয়ে চলেছেন, পারফরমেন্সের ভিত্তিতে নয়। আজাহার থাকাকালীন

বেঙ্কটপতি রাজুর কথা। তখন দলে রাজুর জায়গা ছিল পাকা। আজাহারের অধিনায়কত্ব যেতেই রাজু ভারতীয় দলের বাইরে। বর্তমান অধিনায়ক শচীন তেন্ডুলকরও এর ব্যতিক্রম নন। বাল্যবন্ধু কাম্বলির জন্য তার বারবার সুপারিশ তো সকলের জানা। শুধু কি তাই, সাহারা কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফর্মে থাকা সৌরভকে বসিয়ে খেলিয়ে ছিলেন কাম্বলিকে। তিনি সফল হন নি।

যা হোক, কাম্বলি সফল না হলেও লর্ডস থেকেই সৌরভের যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখনও অব্যাহত। সাবাকেও এখন আর প্রয়োজনাতিরিক্তদের দলে ফেলে দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই এরা শুধু ভারতীয় দলে অপরিহার্যই হবেন না, অনুপ্রাণিত করবেন বহু বাঙালীকে বা অন্য রাজ্য থেকে আসা বাংলার ক্রিকেটারকে। তাই আমরা চাই, সৌরভকে দিয়ে বাঙালীর যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, তার ফসল হিসেবে উঠে আসুক আরও অনেক সৌরভ-সাবা।

প্রসঙ্গ ঃ সুভাষচন্দ্র

—অভিষেক পাল, দ্বাদশ শ্রেণী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ পালিত হল বেশ ঘটা করেই। বাঙালী আরেকবার মেতে উঠল উৎসবের আনন্দে। পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক নেতাজীর মূর্তিস্থাপন করা হল। স্থানে স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জনসভার আয়োজন করা হল, যাতে বক্তৃতা দিলেন আজকের 'নেতা'রা। স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর ভূমিকা যে কি ছিল তা উপলব্ধি করতে তাদের অর্ধশতাব্দী ব্যয় করতে হল। আজ নেতাজীর জন্মবর্ষে বিভিন্ন নেতাই অনেক প্রশংসা করে গলা ফাটালেন, অথচ একদিন রাজনীতি থেকে বিতাড়নের চেষ্টা হয়েছিল এই বীরকে। একটু ভুল হয়ে গেল, বীর কখনও বিতাড়িত হন না, মতের অমিল ঘটায় পথ বদলে নেন, অগ্রসর হন এক অনন্য পথে।

নেতাজী ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য যে পথে হেঁটেছিলেন সেই পথকে অবলম্বন করেননি এখনকার নেতৃবর্গ। অথচ নেতাজীর আজাদ-হিন্দ-ফৌজই ইম্ফলে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বাধীন সরকার গঠন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাহস দেখিয়েছিল। নেতাজী যে সংগ্রাম করেছিলেন সেই সংগ্রাম আবেদন নিবেদনে হাস্যকর নয়, মিটিং-বক্তৃতায় সর্বস্বান্ত নয়, দলে ক্ষমতা লাভের লড়াইতে কলঙ্কিত নয়, ক্ষমতা বাগাবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বারবার দরকষাকষির দ্বারা ধিকৃত নয়। নেতাজীর সংগ্রাম ছিল পুরোদস্তুর সামরিক সংগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আন্তর্জাতিকতা দান করেছিলেন এই নেতাজী। কামান, মেশিনগান,

রাইফেল নিয়ে রক্তক্ষয়ী পার্থিব যুদ্ধ পরিচালনার কথা তৎকালীন ভারতীয় নেতারা ভাবতেই পারেন নি। সেই যুদ্ধেই নেতাজী পরাজিত করেছিলেন দুটি বড় শত্রুকে, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বসে খাদ্যগ্রহণ করত। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ও সহচরদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অহিন্দু।

তার প্রথম ছদ্মবেশ ছিল উত্তরপ্রদেশের মুসলমান জিয়াউদ্দীনের। দুটি বিপজ্জনক যাত্রায় ছিলেন দুইজন মুসলমান সহকর্মী, জার্মাণীর কিয়েল থেকে ইন্দোনেশিয়ার সাবাং পর্যন্ত আবিদ হাসান এবং ব্যাঙ্কক থেকে সায়গণ হয়ে তাইপেতে বিমান যাত্রায় হাবিবুর রহমান। এই এই আবিদ হাসানই বলেছেন—"There was only one whom I could die for, and die a thousand times. It was Netaji." ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের পর একজন হিন্দু সম্পর্কে একজন মুসলমানের এইরকম মন্তব্য সত্যিই বিরল।

এই নেতাজীই দেশের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের ত্যাগ করেন। সদ্যোজাত দু'মাসের কন্যা এবং স্ত্রীকে ফেলে রেখেই তিনি দেশ ছাড়লেন। তাঁর একমাত্র দায় ছিল দেশের কাছে। মায়ের মৃত্যুতে তিনি কাছে থাকতে পারেন নি। প্রত্যক্ষদর্শী জাপানীরা মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে নেতাজীকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখে বিস্মিত হয়। তাই তারা বিস্ময়াপন্ন হয়ে লিখছে, যুদ্ধের বিপদ মাথায় নিয়ে ২৪ ঘণ্টা যে লোক অতিমানবের মত কাজ করছে, সেই লোক মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে শিশুর মত কাঁদে কি করে?

অনেকেই মেনে নিতে পারেন না ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন। এই রকম ভাবনা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা নয়। এই ভাবনা তাঁকে কাপুরুষ সাব্যস্ত করে। তিনি কি এমন অপরাধ করেছেন, যে তাঁকে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও আত্মগোপন করতে হবে। যে মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে বীরের মত পদচারণা করতেন সেই মানুষ কেন আত্মগোপন করতে যাবেন?

নেতাজী সম্পর্কে কৌতূহল কোনো দিন বাঙালীর মন থেকে মুছে যাবে না। নেতাজী চিরকাল বাঙালীর হৃদয়গভীরে পূজিত হবেন। যে মানুষ ভারত স্বাধীন করবার জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সেই নেতাজীকে আজ আর কেউ মনে রাখবার প্রয়োজন বোধ করে না। তাই স্বাধীনতার নামে সকলের চোখের সামনে প্রচার মাধ্যমগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে, যারা কোন একটি বিশেষ পরিবারের সদস্য।

আজ ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ নানারকম সমস্যার রহস্যোদ্ঘাটন করছে। একের পর এক কেলেঙ্কারীর রহস্যের সন্ধান করে মুখোশধারী খ্যাতনামাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। এমনকি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যা রহস্যের জালও প্রায় খুলে এসেছে তবু কেন স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও সাধারণ মানুষ জানতে পারল না বীর পুত্র সুভাষচন্দ্র বসুর পরিণতি।

বন্ধু

সম্রাট চক্রবর্তী, দ্বাদশ শ্রেণী

মানুষের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কোন মানুষই তার বন্ধুর জীবনপথে একা এগিয়ে যেতে পারে না। প্রয়োজন হয় আরও একটি নতুন জীবনের সে বিপদে-আপদে সুসময়ে দুঃসময়ে সুখে-দুঃখে সমানভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। এর থেকে বন্ধু কথাটির উৎপত্তি। এই পথাগত জীবনটি যেন সব সময় কানে কানে বলে যায় ভয় কি তোমার জীবনে যা লক্ষ্য বা কর্ম সব করে যাও আমি তো তোমার পাশেই আছি থাকবও চিরকাল চিরদিন। কোন কিছু করতে গেলে যেমন ত্যাগের প্রয়োজন ঠিক তেমনি প্রকৃত বন্ধুর স্তরে উঠে আসতে হলে বন্ধুর জন্য জীবনের একটা বিরাট অংশ ত্যাগ করতে হয়। যে বন্ধুর জন্য ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তার উর্ধ্বে উঠে আসতে পারবে সেই হল প্রকৃত বন্ধু। প্রকৃত বন্ধুর গুরুত্ব যে কতখানি তা শুধু বর্তমান নয় পুরানো যুগ থেকে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে আমাদের সামনে। পুরানো মহাকাব্য রামায়ণ মহাভারতের সুগ্রীব-রামচন্দ্রের বন্ধুত্ব এবং কর্ণ-দুর্যোধনের বন্ধুত্বের প্রগাঢ় বন্ধন প্রকৃত বন্ধুত্বের গুরুত্বকে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বন্ধুর আনুকুল্যে মানুষ পায় জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জীবনমন্ত্র, লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষ লক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, মানুষের জীবনে হারানো সূর্যকে মানুষ উদয়ের পথে ফিরিয়ে আনে। বন্ধু হল এমন একটি জীবন যাকে পিতামাতার পর মনের কথা অপকটে ব্যক্ত করা যায়। তাইতো মানুষ বন্ধুর অকাল মৃত্যু বা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াকে মেনে নিতে পারে না। ক্রন্দন করে ওঠে ছোট্ট শিশুর মত। তার মনে হয় জীবনে সবকিছু পেয়েও যেন কিছুই পাওয়া হল না। সেই অপূর্ণতার বেদনা বড় কম নয়। বন্ধুহীন মানুষ তাই ভাবে স্ত্রী-পুত্র পিতা-মাতা পেয়ে সংসার গড়ে সংসারী হয়েও সে নিঃসঙ্গ একাকী। তার এই নিসঙ্গতা একমাত্র বন্ধুর দ্বারাই পূর্ণ হতে পারে। তাই সে বন্ধুকে হারানোর বেদনায় জর্জরিত হয়ে নিজেই মৃত্যুকে আহবান করে মিলিত হতে চায় হারানো বন্ধুর আত্মার সঙ্গে, তাই তো আমাদের মনে বেজে ওঠে প্রশ্ন, বেজে ওঠে গান—

"বন্ধুহীনতায় কে বাঁচিতে চাহে রে কে বাঁচিতে চাহে ?"

পরম বন্ধু

অভিষেক মজুমদার (সপ্তম শ্রেণী)

গাছ আমাদের বন্ধু—
একথা আমরা জানি।
তবু আমরা কাঠি গাছ
বিপন্ন করি প্রাণী।
আমরা জেনেছি আমাদেরই মত,
গাছেরও আছে প্রাণ।
তবু তুচ্ছ প্রয়োজন বোধে,
কেটে করি খান খান॥
বন্ধুকে মারি প্রয়োজনের তাগিদে,
সে মরেও উপকার করে।
সে যে বন্ধু তাই সে দেয়,
উপকার অকাতরে॥
সবাই যদি একটা করে—
বৃক্ষ রোপণ করি,
তবে এ পৃথিবী অমর হবে—
সবুজে যাবে ভরি॥

যানবাহন ও দূষণ

অনির্বাণ কুণ্ডু (ষষ্ঠ শ্রেণী)

কলকাতার সব যানবাহন,
যেন সব দশানন,
বাতাস করতে সব দূষণ,
অসুস্থ হচ্ছে সব জনগণ।
এই দূষণ রোধের জন্য কত নিয়ম করা হল,
কিন্তু জনগণের সাহায্য না পেলে কি
করে কি হবে বল?

রোদন

পরাগ গুহঠাকুরতা (হেয়ার স্কুল)

সুখে দুঃখে উচ্ছ্বাস আবেগে
অক্ষির বাঁধ ভেঙে,
অশ্রুবারি ঝরে পড়ে কপলে।
চোখের পলক বুজল
যা, গড়িয়ে পড়ে,
তাই কি প্রকৃত রোদন।
রবীন্দ্রনাথের রোদন ভরা বসন্তের ন্যায়
কি মাঝে মাঝে কিছুটা
অশ্রুবারি করা হয় ব্যয়?
রোদন কি সেই যা
প্রকাশ্যে ঝরে পড়ে,
না, যা শুধু অনুভব করা যায় অন্তরে।

ছবি

তরুণ শঙ্কর কুণ্ডু (শিক্ষক)

হৃদয়ের উৎস-মুখে এই সব গান—
একদিন স্তব্ধ হবে জানি
তবু তখনও রাত্রি
নীহারিকা নিয়ে
অনন্ত আঁধারের পথ পাড়ি দিয়ে যাবে।
তারার হারেমে
তখন চন্দ্রমা
ছড়াবে বিগলিত জোছনা;
চালতার চিকন পত্রালী ছুঁয়ে
পড়িবে ঝরিয়া শিশির-কণা
সারারাত টুপটাপ ঘুরে।
ধূসর ডানার এক রাতচর প্যাঁচা
ফিরিবে হিজলজারুল বনে
রাতজাগা ক্লান্ত করুণ চোখে।

অনুভব

শুভ্র ব্যানার্জী, দ্বাদশ শ্রেণী

তোমারে দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমারে দেখেছি শারদ প্রাতে,
তোমারে পেয়েছি দুখের মাঝে,
খুঁজেছি তোমারে জীবন মাঝে।
ভেবেছি তোমারে রজনী ধরে
ডেকেছি তোমারে গীত গেয়ে
এসেছো মোর জীবন সাঁঝে
রূপ হতে রূপে
সুর হতে সুরে
গান হতে গানে।
চলেছি মোরা হাত ধরে
জীবনের সাগর বেয়ে
নীল আকাশে স্বপ্ন বুনে
সদাই রাতদিন।
পূব আকাশের সোনালী আলোয়
জ্যোৎস্না রাতের গলানো রূপোয়
দেখেছি মোরা স্বপ্ন নতুন
মায়া পৃথিবীর।
হোক না যত আঁধার কালো
আসবে নতুন দিনের আলো
আমরা সদাই বাসবো ভালো
দুজন দুজনকেই

হৃদয়েষু

দেবর্ষি মণ্ডল
(দ্বাদশ শ্রেণী)

আজ আর কথা নয়,
প্রশ্ন নয় কোন ও,
শুধু অনুরোধ
এই আলোয় ভরা অন্ধকারে বেঁধো না আমায়
ঐ অস্পষ্ট অবয়ব—স্পষ্ট কোন রেখার মোড়কে
জীবন্ত ধরতে চাই।
শুধু সুগন্ধের মরিচীকা—
আমি বিপন্ন, বিহ্বল।

এই নীরব কোলাহল থেমে যাক—
সব রঙ হেসে উঠুক—আলোর হাত ধরে
অতৃপ্তির অলসতা হোক অন্তিম অতীত
তোমার একান্ত গেলেন সান্নিধ্যে
হঠাৎ ঘোর কাটে নিঃসের চেতনায়
রুদ্ধশ্বাস নাটকের যবনিকা পড়ে।

আমি আমার সামনে চুপ
এই একাকিত্বই আমার ঔদ্ধত্ব
আমার কাঁধ ঝাঁকানো অহঙ্কার।
তবু তোমাকে চাই
সব গোপনতার আড়ালে আরো গোপনে॥

বল, কেন এমন হলো

স্বপন কুমার সাহা (শিক্ষক)

পদ্ম শুধোয়, 'শালুক, ওরে,
আমরা ছিলেম একই ঘরে।
আজ তুমি হলে বাংলাদেশী
আর আমি হলাম ভারতবাসী !
বল, কেন এমন হল ?

তোমার সাথে যত অমিল
তার চেয়েও বেশী যে মিল,
তবু তুমি হলে বাংলাদেশী,
আর আমি হলাম ভারতবাসী !
বল, কেন এমন হ'ল ?

বিভেদ প্রাচীর গড়ল যারা
আড়ালেতে রইল তারা,
তারা মানে নাকো কোন তন্ত্র
মুখে তাদের গণতন্ত্র !
বল, কেন এমন হ'ল ?

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান,
শিখ, জৈন, মুসলমান,
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান
হয়না তারা আগুয়ান !
বল, কেন এমন হল ?

ধর্মের জিগির দেয় যে জন,
সমাজের সে অতি কুজন !
সে মানে নাকো মানব ধর্ম ;
করে কেবল অপকর্ম !
বল, কেন এমন হ'ল ?

ধিক্কার

অম্বরীশ সরকার, নবম শ্রেণী

তোমাদের হাসির মধ্যে ফুটে উঠেছে এক কান্নার পূর্বাভাস।
সে কান্না হল তোমাদেরই অত্যাচারে অত্যাচারিত,
হৃদয়ের বেদনায় ব্যথিত, দারিদ্র্যের জ্বালায় জ্বলন্ত,
অনাহারের প্রভাবে প্রভাবিত, ক্ষুধিতের মর্মস্পর্শী কান্না।
তোমরা নিজেদের খুশীর জন্য, নিতান্তই সম্মানার্থে
করে চলেছ এক বা একাধিক খুশীর হত্যা
ফয়দা লুটছ দারিদ্র্যের, ফয়দা লুটছ মানুষের অর্থাভাবের,
দিচ্ছ না তার সঠিক প্রাপ্য অধিকার,
তাই তোমাদের প্রতি আমার শুধুই ধিক্কার, ধিক্কার।

"প্রাইভেট টিউশন বনাম বিদ্যালয়—একটি আত্ম মূল্যায়ণ"

অরিজিৎ বসু (দ্বাদশ শ্রেণী, ক—বিভাগ)

এই তো কিছুদিন আগের কথা, তখন সেপ্টেম্বর মাস হবে। কলকাতার এক নামী স্কুলের এক ছাত্র সুর্যনীলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার স্কুলের শিক্ষক সুবিমল বাবুর। কিন্তু সুর্য্যের তখন মুখ তুলে স্যারের সঙ্গে কথা বলবার ক্ষমতা নেই। কারণ সে উচ্চমাধ্যমিকে মাত্র ৫৪৭ নম্বর পেয়েছে। অথচ সে মাধ্যমিকে পেয়েছিলো ৭২০। স্যার তাকে এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করায় তার উক্তি—J.E.E, I.I.T এর জন্যে অনেক প্রফেসরের কাছে কোচিংয়ে পড়তাম কিন্তু তাতেও I.I.T, J.E.E হল না, আর H.S এর নম্বরও ভাল হল না।" এই সমস্যা আজ ঘরে ঘরে। সবার মুখে মুখে ঘুরছে যে কোচিং-এ পড়েও নম্বর খারাপ আসছে। আর বেশীর ভাগই মধ্যম মানের রেজাল্ট। আর এজন্যই আজ চারিদিকে রব প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার।

যারা এটা বলছে তাদের অভিযোগ

(1) বর্তমানে ছাত্র ছাত্রীদের শিশু অবস্থাতেই স্কুলে ভর্তি করার জন্য মাত্র ২-৩ বৎসরের মধ্যেই কোচিং ক্লাসে পাঠানো হচ্ছে।

(2) কোচিংক্লাসের দৌরাত্মে ছাত্র ছাত্রীরা তার মৌলিকত্ব হারিয়ে নোটকে ভিত্তি করে পড়াশুনা করছে।

(3) ছাত্ররা জানার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

(4) কোনো স্কুলের শিক্ষক তার স্কুলের ছাত্রকে অন্য জায়গায় কোচিংয়ে পড়াচ্ছেন, তারপর পরীক্ষার খাতায় তাকে বেশী নম্বর দিচ্ছেন।

(5) ছাত্ররা পরীক্ষায় নম্বর তোলার জন্য বেশী সাজেসানস্ ভিত্তিক হয়ে পড়ছে।

কিন্তু এই অভিযোগগুলো কী সর্বাগ্রে সত্যি? একেবারেই নয়। এর জন্য প্রধানভাবে দায়ী সমাজব্যবস্থা, অভিভাবক ও শিক্ষকসমাজ ও অবশ্যই সিলেবাস। ৬-৭ বছরের শিশুকে কোচিংয়ে না পাঠিয়ে অভিভাবকরাই তাকে শিক্ষাদান করতে পারে। কিছু কিছু অভিভাবকেরা এটা ফ্যাশন বলে মনে করেন। তাঁরা ভাবেন কোচিং-এ পাঠালেই সন্তান উচ্চশিক্ষিত ও বেশী নম্বর পাবে। কিন্তু আজ আর অভিভাবকরা ছোটদেরকে রূপকথার বই পড়তে দেন না। তার বদলে আছে টিনটিন, চাচা চৌধুরী—তাহলে শিশুদের মনের পরিধি বিস্তার হবে কী ভাবে। এই প্রাইভেট টিউশন ব্যবস্থার জন্য বর্তমান সমাজব্যবস্থাও দায়ী। আজ এগিয়ে চলার যুগ। প্রতি বাবা মায়ের স্বপ্ন থাকে তার সন্তান স্কুলে প্রথম বা এক থেকে দশের মধ্যে থাকুক। যেহেতু সন্তান প্রথমে তার বাবা মাকে দেখে, তাই তাদের খুশি করার জন্য তারা বাধ্য হয়ে কোচিং ক্লাশের সাহায্য নেয়। ভালো শিক্ষকদের কোচিং কখনই নোট বা সাজেসনস্ ভিত্তিক হয় না। যে সকল ছাত্র ছাত্রী মৌলিক প্রতিভার অধিকারী তারা কখনই সেই প্রতিভা থেকে বিচ্যুত হয় না। বরং

কোচিং এর মধ্যে গিয়ে সে তার প্রতিভাটিকে আরও শানিত করে তোলে। কোচিং তাদের কাছে হয় সঠিক পথ প্রদর্শক।

'মূল্যায়ণ' ই শিক্ষার মূলকথা। কে কত জ্ঞানী, কত পড়েছে—তা সমাজ চায় না, মানে না। সমাজ চায় কে বেশী নম্বর পেয়েছে। প্রকৃতভাবে লেখার বিভিন্ন কারিগরি কৌশল শেখায় কোচিং ক্লাশ। বৃহৎ সিলেবাসকে পরীক্ষার উপযুক্ত করে ছাত্রদের নম্বর পেতে সাহায্য করে কোচিং ক্লাশ। তাহলে কোচিং ক্লাশের কিছু ভাল ফলও আছে।

আজ যারা প্রাইভেট টিউশনের বিপক্ষে তারা বলে আজকের শিক্ষা, পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষা। কিন্তু তারা ভুলে যায় মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য চাই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। এর জন্য চাই অর্থ। অর্থের উৎস যেহেতু উচ্চ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা মানেই অংশত আবার পরীক্ষায় প্রাপ্ত প্রচুর নম্বর তার জন্য প্রাইভেট কখনই বন্ধ হবে না। আমি, আপনি যদি এর বিরুদ্ধেও বলি, যদি কাগজেও অনেক লেখালেখি হয়, যদি টিভিতেও অনেক অনুষ্ঠান হয় তাও এ ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনি থাকবে, সেখানে ছাত্র ভালো ফল করুক আর খারাপই করুক।

ক্রিকেট প্রাদেশিক মাধ্যম

—সন্দীপ কুমার বসু (দ্বাদশ শ্রেণী)

পঞ্চাশ দশকের প্রথমদিকে কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতের সাথে ইংল্যাণ্ড দলের টেস্ট ম্যাচ। দুদিন আগে খবর বেরোল মুস্তাক আলি টিম থেকে বাদ। ইডেনে পোস্টার, বিক্ষোভ সমাবেশ, স্লোগান উঠল, 'নো মুস্তাক, নো টেস্ট'। ভারতীয় নির্বাচকেরা বাধ্য হলেন মুস্তাককে নিতে। মাঠে মুস্তাক জবাব দিলেন; প্রথম বল ডেলিভারির আগেই ব্যাট কাঁধে তুলে ক্রিজের থেকে এগিয়ে গেলেন, স্কোয়ার লেগ দিয়ে প্যাভেলিয়ানের দিকে। অবশ্য যাবার আগে দর্শকদের প্রণাম জানাতে ভুল করেননি। মুস্তাক এ-ধরনেরই ব্যাটসম্যান ছিলেন। খেলতেন কেতাবী ঢঙে। বাঙালী ক্রিকেট-প্রেমীরা ছিলেন মুস্তাকের দারুণ ভক্ত। এই ছিল সেদিনের ক্রিকেটের সংস্কৃতি।

এখন সুনীল গাভাসকার রবিশাস্ত্রী বেঙ্গসরকার ক্রিকেটকে প্রাদেশিক হাতিয়ার করে তুলেছেন। তবে একথা একবারও বলছি না বাঙালীরা প্রাদেশিক নন। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলীর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে গাভাসকার, রবিশাস্ত্রী যা করলেন বা করছেন তা হয়তো 'ঐতিহাসিক অপরাধ' রূপে চিহ্নিত হওয়া উচিত। এক বড় মাপের ব্যাটসম্যান হয়েও গাভাসকার যে এক স্বার্থান্বেষী মারাঠী সেটাই প্রকট হল ২৭ নভেম্বরের ইডেনের ড্রেসিং রুমে। সৌরভের ব্যাটিং অর্ডারের নির্দেশ লিখে পাঠালেন মদনলালকে। রবি শাস্ত্রীর মতো একজন স্পিনার এবং ব্যাটসম্যান আজ ভারতীয় দলের ব্যাটিং অর্ডার কি হবে তা ঠিক করছেন মাঠের বাইরে ওবেরি গ্র্যাণ্ড হোটেলের ৩৭৯নং কামরায় বসে।

সিঙ্গার কাপে ভারত-অষ্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগের দুদিন এবং পরদিন কলিকাতার প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে সৌরভ কেন্দ্রিক যে সব খবর ছাপা হল তা ক্রিকেটের স্তর ছাড়িয়ে প্রাদেশিকতার স্তরে চলে গিয়েছে। ভারতীয় দলে আঞ্চলিক কোটা প্রথার বিরুদ্ধে বর্তমানে সরব—সোচ্চার মারাঠীরা বোধ হয় ভুলে গেছেন, একটা সময়ে ভারতীয় দলে ৭-৮ জন খেলোয়াড়ই থাকতেন 'বোম্বাই কা বাবু' রূপে। তাঁরা কি প্রত্যেকেই যোগ্যতায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী? রবি শাস্ত্রী-ই হলেন এর আদর্শ নিদর্শন। নিজের ক্রিকেট দক্ষতা নিয়ে যতবারই তিনি বিতর্কের চূড়ায় উঠেছেন, ততবারই হয় নিজেকে আড়াল করতে গিয়ে বলেছেন, 'নো কমেন্টস' নতুবা সাংবাদিক বা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কিছুটা তর্জন-গর্জন করে ঝিমিয়ে পড়েছেন। অবশ্য এখন ভাষ্যকর রূপে ভারতীয় দল গঠন কি হবে তা বিলাস বহুল পাঁচতারা হোটেলে বসে নির্দ্বিধায় বলে চলেছেন।

ক্রিকেট নিয়ে এসব লেখাটা বাড়াবাড়ি হতে পারে। ক্রিকেট এখন ব্যবসায়িক ও পুঁজি-তান্ত্রিক হয়ে ওঠার জন্যই এটা আসছে। ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীগণ ক্রিকেটের উদ্ভব ও দাপট নিয়ে পর্যালোচনা করছেন। তাঁরা এই পর্যালোচনা প্রকল্পের নাম দিয়েছেন 'Farjine Culture'। এদেশেও ক্রিকেট নিয়ে সামাজিক বিশ্লেষণ প্রথম শুরু করেছেন বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক আশিস নন্দী, অনিলাভ চ্যাটার্জী, পি, টি, আই-এর সভাপতি আশিস বিশ্বাস এবং বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক সব্যসাচী সরকার একবার লিখেছিলেন, 'টাকা এবং প্রচার মাধ্যমের দাপটে খেলা এখন হয়ে উঠছে গোষ্ঠী বা জাতিসত্তা জাহিরের মাধ্যম। নতুবা দোকানদার, রাস্তার মজুর খেলার ফলাফল নিয়ে এত মত্ত কেন? বিশেষ করে ভারত পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে। এদের মধ্যে অনেকেই ক্রিকেটের—'ক' জানেন না।'

সারা বিশ্বে জাতিসত্তা, গোষ্ঠীসত্তা, সংখ্যালঘু সত্তা বা মাইনরিটি কমপ্লেক্স জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ পাচ্ছে। সৌরভ গাঙ্গুলিকে ঘিরে বাঙ্গালীর আজকে যা হয়েছে, সর্বভারতীয় স্তরে এককালে শ্রেষ্ঠ,—এই উত্তরাধিকার জাহিরে অভ্যস্ত বাঙ্গালী নতুন নায়ক খুঁজে চলেছে যাকে প্রতীক করে এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর। ফুটবল, ক্রিকেট এসবই আজ প্রাদেশিক আইডেন্টিটির দ্যোতক। ইউরোপীয় ফুটবলকে ঘিরে এই কাণ্ড চলছে। শুধু খ্রীষ্টান বা ইতালি নয়, নেদারল্যান্ড এর মতো ছোট দেশেও এই কাণ্ড। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ ফুটবল হওয়ার সময়ে একই ব্যাপার ঘটে।

মানুষ কি তাহলে জীবনের মূল স্তরে সত্তা খুঁজে পাচ্ছে না? —এটা সত্যই একটা শক্ত প্রশ্ন এবং চটজলদি জবাব দেওয়াও শক্ত। ক্রিকেট ঘিরে আজ যে প্রাদেশিকতা চলছে তা সত্যিই অভাবনীয়।

প্রকাশক: শুভময় নাগ, মুদ্রক: ব্রজগোপাল মাইতি, শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং, ৩০ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬